بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ মার্চ, ২০২০ মোতাবেক ০৬ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

গত খুতবায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র স্মৃতিচারণ হয়েছিল, যার কিয়দাংশ বাকি রয়ে গিয়েছিল, যা আজ আমি বর্ণনা করব। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) সম্পর্কে অর্থাৎ তাকে যে মদীনায় মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে এবং তাঁর সেবার কথা উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.)-কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বারংবার সংবাদ দেয়া হচ্ছিল, তোমার হিজরতের সময় ঘনিয়ে আসছে। এছাড়া তাঁর (সা.) কাছে এটিও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাঁর হিজরতের স্থান হল এমন একটি শহর যেখানে কূপও রয়েছে আর খেজুরের বাগানও বিদ্যমান। প্রথমে তিনি (সা.) মনে করেন, হয়ত ইয়ামামাই হবে তাঁর হিজরতের স্থান। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর (সা.) হৃদয় থেকে এই ধারণা দূর করে দেয়া হয় আর তিনি (সা.) এই অপেক্ষায় থাকেন, খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে শহরই নির্ধারিত রয়েছে, তা ইসলামের নিরাপদ দুর্গ বানানোর জন্য স্বয়ং নিজেকে উপস্থাপন করবে। ইতোমধ্যে হজ্জের মৌসুম চলে আসে। আরবের চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় হজ্জের জন্য সমবেত হতে আরম্ভ করে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী যেখানেই কয়েকজনকে দাঁড়ানো দেখতেন, তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে তৌহীদের বাণী শোনাতে আরম্ভ করতেন এবং ঐশী রাজত্বের সুসংবাদ প্রদান করতেন, অন্যায়, পাপাচার, নৈরাজ্য ও দৃষ্কৃতি পরিহার করার উপদেশ দিতেন। অনেকে তাঁর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে সরে পড়ত। কেউ কেউ কথা শুনতে থাকলে মক্কার লোকেরা এসে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত। আবার কেউ কেউ যারা পূর্বেই মক্কার লোকদের কথা শুনেছিল, তারা বিদ্রূপ করে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সরে পড়ত। এমতাবস্থায় তিনি (সা.) মিনা উপত্যকায় ঘুরছিলেন তখন ছয়-সাতজন মদীনাবাসীর ওপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, আপনারা কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন? তারা উত্তরে বলে, খাযরাজ গোত্রের সাথে। তিনি (সা.) বলেন, সেই গোত্র যারা ইহুদীদের মিত্র? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, আপনারা কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবেন কি? তারা যেহেতু তাঁর (সা.) বিষয়ে পূর্বেই শুনেছিল, আর তাদের হৃদয়ে তাঁর দাবির বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, তাই তারা তাঁর কথায় সম্মত হয় এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, **ঐশী রাজত্ব সন্নিকটবর্তী। এখন পৃথিবী থেকে প্রতিমা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। পৃথিবীতে তৌহীদ বা খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। পুণ্য এবং তাক্বওয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। মদীনাবাসীরা এই মহান নিয়ামতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কি?** তারা তাঁর (সা.) কথা শুনে প্রভাবিত হয় এবং বলে, আপনার শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করছি। বাকি রইল একথা যে, মদীনাবাসী ইসলামকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা? এজন্য আমরা দেশে ফিরে স্বজাতির সাথে কথা বলব এবং আগামী বছর তাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে অবহিত করব। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর (সা.) শিক্ষার উল্লেখ করতে আরম্ভ করে। তখন মদীনায় দু'টি আরব গোত্র অওস

ও খাযরাজ, আর তিনটি ইহুদী গোত্র অর্থাৎ বনু কুরায়যাহ্ ও বনু নযীর এবং বনু কায়নুকা' বসবাস করত। অওস এবং খাযরাজ ছিল পরস্পর বিবদ-মান। বনু কুরায়যাহ্ এবং বনু নযীর অওসের সাথে আর বনু কায়নুকা' খাযরাজের সাথে মিত্রতা রাখতো। দীর্ঘদিন বিবাদের পর তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল যে, আমাদের পরস্পর সন্ধি করে নেয়া উচিত। অবশেষে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, যে খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিল, তাকে পুরো মদীনা নিজেদের বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নিবে। ইহুদীদের সাথে সম্পর্কের কল্যাণে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী শুনতো। ইহুদীরা যখন নিজেদের বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করত তখন এর শেষে এটিও বলতো, মূসা'র মসীল বা সদৃশ একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। তাঁর আগমনের সময় সন্নিকট। যখন তিনি আসবেন, আমরা পুনরায় পৃথিবীতে জয়যুক্ত হব। ইহুদীদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেয়া হবে। সেই হাজীদের কাছে মদিনাবাসীরা যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাবির কথা শুনে আর তাঁর (সা.) সত্যতা তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়; তারা বলে, তাঁকে তো সেই নবীই মনে হচ্ছে যাঁর সংবাদ ইহুদীরা আমাদেরকে দিত। অতএব অনেক যুবক (এ কথা শুনে) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষার সত্যতায় প্রভাবিত হয় আর ইহুদীদের কাছ থেকে শোনা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের ঈমান আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (সাহায্যকারী হয়) অতএব পরের বছর হজ্জের সময় পুনরায় মদীনার লোকেরা আগমন করে। এবার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্ম গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে বারোজন মদীনা থেকে যাত্রা করে। তাদের মাঝে দশজন ছিল খাযরাজ গোত্রের আর দু'জন অওস গোত্রের। তারা মিনা'য় তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করে আর তারা তাঁর হাতে এই শর্তে অঙ্গীকার করে যে, **তারা খোদা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা পাপাচারে লিপ্ত হবে না, তারা নিজেদের কন্যাসন্তানদের হত্যা করবে না, তারা পরস্পরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না আর তারা খোদার নবীর অন্যান্য পুণ্য শিক্ষায় তাঁর অবাধ্য হবে না।**

তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির মাঝে আরো জোরালোভাবে তবলীগ করতে আরম্ভ করে। মদীনার বাড়িঘর থেকে প্রতিমাগুলো বের করে বাহিরে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ হয়ে যায়। প্রতিমার সামনে যারা মাথা নত করতো তারা এখন মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। এখন খোদা ব্যতিরেকে আর কারো সামনে মানুষের মাথা নত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইহুদীরা হতবাক হয়ে ভাবছিল, শতশত বছরের বন্ধুত্ব এবং শত শত বছরের তবলীগের মাধ্যমে যে পরিবর্তন তারা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, ইসলাম ধর্ম মাত্র কয়েক দিনে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছে। তওহীদের বাণী মদিনাবাসীদের হৃদয়ে আসন করে নিচ্ছিল। একের পর এক মানুষ আসতো আর মুসলমানদের বলতো, আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দাও। কিন্তু মদীনার নওমুসলিমরা নিজেরাও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না আর শত-শত বরং হাজার-হাজার মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলার মতো জনবলও তাদের কাছে ছিল না। তাই তারা একজনকে মক্কায় প্রেরণ করে এবং মুবাল্লিগ (প্রেরণের) আবেদন করে। তখন মহানবী (সা.) মুসআব নামের একজন সাহাবীকে, যিনি ইথিওপিয়া-ফেরত মুহাজির ছিলেন, মদীনায় ইসলামের তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুসআব (রা.) মক্কার বাহিরে প্রথম মুসলিম মুবাল্লিগ ছিলেন।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২১৬)**

অপর এক স্থানে এই বিষয়েরই উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, "মদীনাবাসীরা ইসলামের সংবাদ লাভ করার পর এক হজ্জের সময় মদীনার কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির কাছে উল্লেখ করে, মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরা যে রসূলের আগমনের কথা উল্লেখ করত, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এতে তাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর তারা পরবর্তী হজ্জে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদল তাঁর (সা.) সাথে মতবিনিময়ের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর হাতে বয়আত করে। তখন যেহেতু মক্কায় তাঁর (সা.) প্রচণ্ড বিরোধিতা হচ্ছিল তাই মক্কাবাসীদের দৃষ্টির অগোচরে এক উপত্যকায় এই সাক্ষাৎ হয় আর সেখানেই বয়আতও করা হয়। এ কারণে এটিকে আকাবার বয়আত বলা হয়।" আকাবার অর্থ হল, দুর্গম গিরিপথ অথবা দুর্গম পাহাড়ী পথ। অতএব "মহানবী (সা.) তাদেরকে মদীনার মু'মিনদের সংগঠনের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন আর ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে সহায়তা করার জন্য নিজের একজন যুবক সাহাবী মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যেন তিনি সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম শেখান।... তারা (অর্থাৎ, মদীনা থেকে আগতরা) ফিরে যাবার সময় মহানবী (সা.)-কে এই নিমন্ত্রণও দিয়ে যায় যে, যদি মক্কা ত্যাগ করতে হয় তাহলে আপনি মদীনায় চলে আসুন। তাদের ফিরে যাবার অল্প সময়ের মাঝেই মদীনাবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করে এবং মহানবী (সা.) আরো কয়েকজন সাহাবীকে মদীনায় প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন।... এরপর হিজরতের নির্দেশ পাবার পর তিনি (সা.) নিজেও সেখানে চলে যান। আর তাঁর যাবার পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেসব মুশরিক মদীনাবাসী, মুসলমান হয়ে যায়।"

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ২০৩ "আকাবাহ্', করাচীর যওয়ার একাডেমী পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে মুহাজিরদের মূল পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র কাছে ছিল যা মহানবী (সা.) তাকে দিয়েছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

এছাড়া আরেকটি বিবরণ হল, যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, উহুদের যুদ্ধেও মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে ছিল।

মহানবী (সা.) ইসলামী বাহিনীকে সারিবদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন। এ সময় তাঁকে এই সংবাদ দেয়া হয় যে, কুরাইশ বাহিনীর পতাকা তালহার হাতে রয়েছে। তালহা সেই বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতো যা কুরাইশের পূর্বসূরী **কুছাই বিন কেলাব** কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকা বহনের অধিকার রাখত। এটি অবগত হবার পর মহানবী (সা.) বলেন, আমরা জাতিগত বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের বেশি অধিকার রাখি, অতএব তিনি হযরত আলী (রা.)'র কাছ থেকে মুহাজিরদের পতাকা নিয়ে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে তুলে দেন, যিনি সেই

বংশেরই এক সদস্য ছিলেন যার সাথে তালহা সম্পর্ক রাখতো।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৮৮}**

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়ছিলেন আর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে ক্বামিয়াহ্ তাকে শহীদ করেছিল। **{আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৮৩, গযওয়াহ উহুদ, মাকতালু মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দ্বার ইবনে হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

ইতিহাসে লেখা আছে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) পতাকার সুরক্ষার দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রা.) পতাকা বহন করছিলেন, এমতাবস্থায় অশ্বারোহী ইবনে ক্বামিয়াহ্ আক্রমণ হানে আর হযরত মুসআব (রা.) যে হাতে পতাকা বহন করছিলেন সে বাহু অর্থাৎ ডান বাহুতে তরবারির আঘাত করে তা কেটে ফেলে। হযরত মুসআব (রা.) তখন এই আয়াত পড়েন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ **(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)** এবং পতাকা বাম হাতে তুলে নেন। ইবনে ক্বামিয়াহ্ তখন বাম হাতের ওপর আঘাত করে তা-ও কেটে ফেলে। তখন তিনি উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বক্ষে আঁকড়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামিয়াহ্ তৃতীয়বার বর্শার আক্রমণ হানে আর (তা) হযরত মুসআব (রা.)'র বক্ষে বিদ্ধ করে, বর্শা ভেঙে যায় (এবং) হযরত মুসআব (রা.) পড়ে যান। তখন বনু আব্দুদ্ দ্বার এর দু'ব্যক্তি সুয়ায়বাত বিন সা'দ বিন হারমালাহ্ (রা.) ও আবু রূম বিন উমায়ের (রা.) এগিয়ে আসেন এবং আবু রূম বিন উমায়ের (রা.) পতাকা তুলে নেন আর তা মুসলমানদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তার হাতেই ছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

শাহাদতের সময় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র বয়স ছিল চল্লিশ বছর অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, "কুরাইশ বাহিনী প্রায় চতুর্দিক থেকেই ঘিরে রেখেছিল এবং উপর্যুপুরী আক্রমণ করে ক্ষণে ক্ষণে মুসলমানদের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছিল। এমন পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা হয়ত কিছুক্ষণ পরই আবার নিজেদের সামলে নিত, কিন্তু তখন যে সর্বনাশ হয় তা হল, কুরাইশদের এক বীর সৈনিক আব্দুল্লাহ্ বিন ক্বামিয়াহ্ মুসলমানদের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে ফেলে। হযরত মুসআব (রা.) তৎক্ষণাৎ অপর হাতে পতাকা তুলে নেন এবং ইবনে ক্বামিয়াহ্র সাথে লড়াই করার জন্য সম্মুখে এগিয়ে যান, কিন্তু সে অপর এক আঘাতে তার দ্বিতীয় হাতও কেটে ফেলে। এতে হযরত মুসআব (রা.) তাঁর কর্তিত উভয় হাত এক করে ইসলামের পতনোন্মুখ পতাকা ধরে রাখার চেষ্টা করেন এবং তা নিজের বুকের সাথে জাপটে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামিয়াহ্ তাঁর ওপর তৃতীয়বার আঘাত হানলে হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। পতাকা যদিও অন্য একজন মুসলমান ত্বরিৎ এগিয়ে এসে হাতে তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু হযরত মুসআব (রা.)'র গড়ন-গঠন যেহেতু অনেকটা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে ক্বামিয়াহ্ মনে করেছিল, সে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছে। অথবা এটিও হতে পারে, শুধুমাত্র দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলক

উদ্দেশ্যে সে এ কথা ছড়িয়েছে। যাহোক, হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এ সংবাদ (শুনে) মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্যমটুকুও হারিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের বাহিনী পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৯৩}**

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের হতোদ্যম হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু যাহোক, পরবর্তীতে তারা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন হযরত মুসআব (রা.)'র লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তার লাশ উপুর হয়ে পড়ে ছিল। মহানবী (সা.) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করেন, مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (সূরা আল্ আহযাব: ২৪) অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও আছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিল, তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব তাদের মাঝে এমনও আছে যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা এখনও অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের কর্মপন্থায় কখনোই কোন পরিবর্তন করে নি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, **ইন্না রাসূলাল্লাহি ইয়াশহাদু আন্নাকুমুশ্ শুহাদাউ ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্।** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তাকে (শেষ দেখা) দেখে নাও এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যে-ই তাকে সালাম করবে তিনি তার সালামের উত্তর দিবেন। হযরত মুসআব (রা.)'র ভাই হযরত আবু রোম বিন উমায়ের, হযরত সোয়ায়বাত বিন সা'দ এবং হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) হযরত মুসআব (রা.)-কে কবরে সমাহিত করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"উহুদের শহীদদের মাঝে অন্যতম ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)। তিনি মদীনায় ইসলামের মুবাল্লিগ হিসাবে আগমনকারী সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে মক্কার যুবকদের মাঝে মুসআব (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি কেতাদুরস্ত ও অভিজাত মনে করা হতো আর তিনি খুবই আভিজাত্যের মাঝে বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একবার তার দেহে একটি কাপড় দেখেন যাতে অনেক জোড়া-তালি দেওয়া ছিল, তখন তাঁর স্মৃতিপটে হযরত মুসআব (রা.)'র প্রথম যুগের চিত্র ভেসে উঠে এর ফলে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে পরে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা.) যখন শহীদ হন তখন তার পরনে এতটুকু কাপড়ও ছিল না যা দিয়ে তার পুরো দেহ আবৃত করা সম্ভব হতো। পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মাথা কাপড় দিয়ে আবৃত পর ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হয়।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫০১}**

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) রোযাদার ছিলেন। তার সামনে ইফতারের সময় খাবার আনা হলে তিনি বলেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাকে একটি মাত্র কাপড়ে কাফন

দেয়া হয়েছিল। তার মাথা আবৃত করলে তার পা অনাবৃত হয়ে যেত আর পা আবৃত করলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। বর্ণনাকরী বলেন, আমার মনে হয় (তিনি) এও বলেছিলেন, হামযা (রা.) শহীদ হয়েছেন, আর তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমরা জাগতিক সেসব স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি অথবা এভাবে বলেছেন, আমাদেরকে জাগতিক সেসব জিনিস দেয়া হয়েছে আর আমার ভয় হয়, কোথাও আমরা আমাদের পুণ্যের প্রতিদান খুব দ্রুতই প্রাপ্ত হইনি তো! এরপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তিনি আহার্য র

আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি এবং পরজগতে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার তার দৃষ্টিপটে ভেসে উঠে, যে কারণে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। অর্থাৎ আমরা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছি যে, এ জগতেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরো প্রতিদান দিয়ে দেন নি তো এবং এমন যেন না হয় যে, পরপারে গিয়ে আমরা আর কিছুই পাব না।

হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে দেশত্যাগ করি, আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ছিলাম আর আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার দায়িত্বে ছিল। আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আর তারা তাদের প্রতিদান থেকে কিছুই ভোগ করে নি। তাদেরই একজন হলেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে আর তারা সেই ফল ভোগ করছে। হযরত মুসআব (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর তাকে কাফন দেয়ার মতো কেবল একটি চাদরই আমরা পেয়েছিলাম। আমরা যখন সেটি দিয়ে তার মাথা আবৃত করতাম তখন তার পা অনাবৃত হয়ে পড়ত আর আমরা যদি তার পা আবৃত করতাম তাহলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। তখন মহানবী (সা.) আমাদের বলেন, আমরা যেন তার মাথা ঢেকে দেই এবং তার পায়ের ওপর ইযখার ঘাস দিয়ে দেই। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব ইযা লাম ইউজাদ কাফনান্ ইল্লা মা ইউওয়ারি রাসেহ্, হাদীস নং: ১২৭৬)**

তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে সম্ভ্রান্ত সাথি দান করেছেন অথবা বলেছেন, নেতা দান করেছেন, কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তখন আমরা নিবেদন করি, তারা কারা? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি এবং আমার দুই পুত্র জা'ফর ও হামযা, আবু বকর, উমর, মুসআব বিন উমায়ের, বিলাল, সালমান, মিক্বদাদ, আবু যর, আম্মার এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। **(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাক্বেব, হাদীস নং: ৩৭৮৫)**

হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, তার পিতা বলতেন– হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) যখন ঈমান আনয়ন করেন, তখন থেকে নিয়ে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার বন্ধু ও সাথি ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে আমাদের সাথে গিয়েছেন। মুহাজিরদের মাঝে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি এমন কোন মানুষ দেখি নি যে তার চেয়ে অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যার সাথে তার চেয়ে কম মতবিরোধ হবে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসলে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র স্ত্রী হযরত হামনাহ্ বিনতে জাহ্শ (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন মানুষ তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ দেয়, এতে তিনি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। এরপর লোকেরা তাকে তার মামা হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ দেয়, তখন তিনি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং তার ক্ষমালাভের জন্য দোয়া করেন। পুনরায় মানুষ তাকে তার স্বামী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে অবগত করে, তখন তিনি কেঁদে উঠেন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। এতে মহানবী (সা.) বলেন, স্ত্রীর হৃদয়ে তার স্বামীর জন্য এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা থাকে। **(আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৬, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দ্বার ইবনে হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)**

অপর এক বর্ণনায় হযরত হামনাহ্ বিনতে জাহ্শ (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন তাকে বলা হয়, তোমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং আরও বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। লোকেরা বলে, তোমার স্বামীকেও শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বলেন, হায় পরিতাপ! তার কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, মহিলাদের সাথে তাদের স্বামীর এমন এক সম্পর্ক থাকে, যা অন্য কারো সাথে হয় না। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জায়া ফীল্ বুকায়ে আলাল্ মাইয়্যেত, হাদীস নং: ১৫৯০)**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার এক বক্তব্যে এই ঘটনাটি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন যাতে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র শাহাদাতের ঘটনা এবং তাঁর শাহাদতে তাঁর স্ত্রীর যে প্রতিক্রিয়া ছিল, তা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রাহে.) বলেন, সেসব পুরুষ ও মহিলা সাহাবী যাদের আত্মীয়ের সংখ্যা একাধিক হত, তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে সংবাদ দিতেন যেন দুঃখ তাদের হৃদয়কে আকস্মিকভাবে পরাভূত না করে ফেলে। অতএব, যখন হুযূর (সা.)-এর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র বোন হামনাহ্ বিনতে জাহ্শ উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) বলেন, হে হামনাহ্! তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার প্রতিদানের প্রত্যাশা? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মামা হামযা'র। তখন হযরত হামনাহ্ (রা.) বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, **গাফারালাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ্** (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর শাহাদত তাঁর জন্য মহা সুখের ও আনন্দের হোক)। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে হামনাহ্! ধৈর্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি বলেন, এটি কার পুণ্যের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্র। তখন হযরত হামনাহ্ (রা.) পুনরায় বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, **গাফারালাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ্** (আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর শাহাদত তাঁর জন্য মহা সুখের ও আনন্দের হোক)। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হে হামনাহ্! ধৈর্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এবার কার জন্য? মহানবী (সা.) বলেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র জন্য। তখন হযরত হামনাহ্ (রা.) বলেন, হায় পরিতাপ! এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সত্যিই স্ত্রীর ওপর স্বামীর অনেক বড় অধিকার রয়েছে যা অন্য কারো নেই। (এরপর) তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এমন কথা কেন বললে? তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তার সন্তানদের এতিম হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ায় আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আর বিচলিত অবস্থায় আমার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) মুসআব

(রা.)'র সন্তানদের জন্য এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তাদের অভিভাবক ও জ্যেষ্ঠরা যেন তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়ার আচরণ করে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। **(খিতাবাতে তাহের কবল আয খিলাফত, পৃঃ ৩৬৩)**

এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহের আচরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হয়। এখানে হযরত মুসআব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হল; ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে।

এখন আমি বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু কথা বলে জামা'তের বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেমনটি বিভিন্ন সরকার এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসছে, আমাদের সবার সেসব সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একেবারে প্রথমদিকে হোমিও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আমি কয়েকটি হোমিও ঔষধের কথা বলেছিলাম যেগুলো সাবধানতামূলকভাবে ব্যবহারের জন্যও আর কোন কোনটি চিকিৎসাস্বরূপও। সেগুলো ব্যবহার করা উচিত, এগুলো সম্ভাব্য চিকিৎসা মাত্র। আমরা এ কথা বলতে পারি না, এগুলো শতভাগ কার্যকর চিকিৎসাপত্র অথবা এই ভাইরাস সম্পর্কে হোমিও চিকিৎসকরা পুরোপুরি অবগত। এটি এমন এক ভাইরাস, যার সঠিক জ্ঞান নেই কিন্তু এই ধরনের রোগের সম্ভাব্য যে চিকিৎসা হতে পারে তা সামনে রেখে এই ঔষধগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এগুলোর মাঝে নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করুন। অতএব, এগুলো ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু এর পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক যেমন কিনা ঘোষণা করা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় বিষয় হল, জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা। মসজিদে আগমনকারীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যদি সামান্য জ্বরও থাকে, শরীরে ব্যাথা-বেদনা থাকে অথবা হাঁচিকাশি কিংবা সর্দি থাকে তাহলে মসজিদে আসা উচিত নয়। মসজিদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। মসজিদের একটি অধিকার হল, সেখানে যেন এমন কেউ না আসে যার কারণে অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। যে কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মসজিদে আসার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ অবস্থায় এবং বর্তমানে বিশেষ করে হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় সবার উচিত মুখে হাত কিংবা রুমাল দেয়া। কোন কোন নামাযীও এই অভিযোগ করে থাকে যে, কেউ কেউ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁচি দেয় অথচ তারা মুখের সামনে হাত কিংবা রুমাল কিছুই রাখে না। আবার এত জোরে হাঁচি দেয় যে, আমাদের গায়েও থুতুর ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। অতএব পাশে দাঁড়ানো নামাযীদেরও অধিকার রয়েছে। তাই সবার এবং নামাযীদের এ বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডাক্তাররা বর্তমানে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছেন তা হল, হাত ও মুখমণ্ডল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। হাত নোংরা থাকলে মুখমণ্ডলে হাত দিবেন না। হাতে স্যানিটাইজার বা জীবাণুনাশক লোশন লাগিয়ে রাখুন কিংবা বার বার ধৌত করুন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ যদি পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত হয়, আর পাঁচবেলা রীতিমত ওযূ করে, নাকে পানি দেয়, যার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার হয় এবং যথাযথভাবে ওযূ করা হয় তাহলে এটি পরিচ্ছন্নতার এমন এক উন্নত মান যা স্যানিটাইজার-এর ঘাটতিও পূরণ করে দেয়। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে বাজারে স্যানিটাইজার ফুরিয়ে গেছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে সবকিছু কিনে নিয়ে গেছে, দোকানের তাকগুলো খালি। বিশেষত এমন সব জিনিস (নেই) যা এই কাজে

ব্যবহার হতে পারে। যাহোক, সঠিকভাবে যদি ওযূ করা হয় তাহলে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাও হয় আর মানুষ যখন ওযূ করবে এরপর নামাযও পড়বে– তাহলে এটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার মাধ্যমও সাব্যস্ত হবে। এছাড়া বর্তমানে বিশেষভাবে দোয়া করারও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি মসজিদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছি। এটিও বলে দিচ্ছি, বিশেষ করে শীতের সময় এবং সাধারণ দিনেও যারা মোজা পরে মসজিদে আসেন- তাদের প্রত্যেক দিনই মোজা পরিবর্তন করা উচিত এবং ধোয়া উচিত। যদি মোজা বা পা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে তাহলে পাশে দাঁড়ানো নামাযীদের জন্য এটি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, কিংবা পিছনের সারিতে যে নামাযী সিজদা করছেন তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। মহানবী (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেছেন, কোন দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস, যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে আসবে না। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আতেমাহ্, বাব ফি আকলিছ ছুম, হাদীস নংঃ ৩৮২৩)**

কখনো কখনো ঢেঁকুর ইত্যাদি ওঠে বা এমনিতেই মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, যা নামাযীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এটি নামাযীদের জন্য এবং মসজিদের পরিবেশের জন্যও কষ্টকর পরিস্থিতির অবতারণা করে। বরং এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মসজিদে এলে সুগন্ধি লাগিয়ে এসো **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, বাব আদ্ দোহনু লিল জুমুআ, হাদীস নংঃ ৮৮৩)** বরং এতটা সাবধানতার শিক্ষা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে হেঁটেও যেও না'**। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব মা ইউকরাহু ফিল মাসাজিদ, হাদীস নংঃ ৭৪৮)** সেখানে কেউ (দুর্গন্ধ নিয়ে) বসে থাকা তো দূরের কথা। কাজেই, দেহের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাও একজন নামাযীর জন্য নিতান্ত আবশ্যক। এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু এর অর্থ এটিও নয় যে, এই ছুতোয় মসজিদে আসা ছেড়ে দিবেন। নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হৃদয় থেকে ফতওয়া নেয়া উচিত। আর সদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তাই যদি কোন অসুস্থতা থাকে তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, এটি কোন্ ধরনের অসুস্থতা। তবে দু'একদিন (মসজিদে আসা) এড়িয়ে চলাও উত্তম।

এছাড়া আজকাল এটাও বলা হচ্ছে, করমর্দন এড়িয়ে চলুন– এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বলা যায় না কার হাতে কি আছে! তাই যদিও করমর্দনের ফলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই রোগের কারণে আজকাল এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম। যেসব বস্তুবাদীরা পূর্বে হইচই করত, তারাও এখন করমর্দন করে না, (পুরুষরা) নারীদের সাথে করমর্দন করে না, (নারীরা) পুরুষদের সাথে করমর্দন করে না– তাদের নিয়ে এখন কৌতুক তৈরী হচ্ছে। জার্মানীর চ্যান্সেলরের সাথে তার মন্ত্রী করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে আর এ–সংক্রান্ত একটি কৌতুক তৈরী হয়েছে। এখানেও একজন সাসংদ বলেছেন, আমরা যে আজকাল করোনাভাইরাসের কারণে করমর্দন এড়িয়ে চলছি তা খুবই ভালো। কেননা করমর্দন করা আমাদের সংস্কৃতি নয়। আমাদের সংস্কৃতি হল, পূর্বে আমরা স্যালুট করতাম অথবা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ঝুঁকতাম। এখন এই সংস্কৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এছাড়া সে এটিও বলেছে, আমরা নারীদের সাথে করমর্দন করি; বরং আলিঙ্গন করে চুম্বনের চেষ্টা করি অথচ আমরা এটা জানিও না যে, নারীরা এটি আদৌ পছন্দ করে কিনা। আর অকারণে জোরপূর্বক আমরা এসব কর্মকাণ্ড করছি। এরা আল্লাহ্ তা'লার কথা মানার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিন্তু এই রোগ এবং এ মহামারী কমপক্ষে এদিকে তাদেরকে মনোযোগী করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা করুন খোদা তা'লার দিকেও যেন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মানার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ছিল; যখন আমরা বলতাম আর একান্ত ভালোবাসার সাথে বলতাম, আমাদের এভাবে সালাম করা নিষেধ বা পুরুষ মহিলার করমর্দন করা নিষিদ্ধ। এ নিয়ে তারা অনেক হৈচৈ করত। কিন্তু এখন শুনছি, বিভিন্ন বিভাগে বা দপ্তরে এবং বিভিন্ন স্থানেও এরা (করমর্দন করতে) অস্বীকার করে এবং অত্যন্ত রুঢ়ভাবে তা করে। আমরা তো অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে এবং নম্রতার সাথে বলতাম, এটি আমাদের শিক্ষা। কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে তারা এতটাই সতর্ক হয়ে গেছে যে, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। যাহোক, এই মহামারী এদিক থেকে তাদের কিছুটা সংশোধন করেছে। আর যেমনটি আমি বলেছি, এই সংশোধন যেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, এই মহামারী আরো কতটা বিস্তৃত হবে এবং কোন পর্যায়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি কী। কিন্তু যদি এই রোগ আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে প্রকাশ পেয়ে থাকে যেমনটি এ যুগে আমরা দেখছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর বিভিন্ন ধরণের মহামারী, রোগ-ব্যাধি, ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার তকদীরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীর এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। (অপর দিকে) পৃথিবীর জন্যও দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও হিদায়েত দিন, আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে সামর্থ্য দিন তারা যেন পার্থিবতায় অতিমাত্রায় নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে এবং খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদাকে শনাক্তকারী হয়।

এরপর আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হল, আকীল আহমদ বাট সাহেবের পুত্র স্নেহের তানযীল আহমদ বাট এর। সে এগারো বছরের ছোট্ট এক বালক ছিল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু তো নয় বরং আমার মতে এটি শাহাদত। তানযীল আহমদ বাট-এর মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটি হল, লাহোরের দিল্লী গেইটস্থ শাহেদ রাহ্ কলোনিতে তাকে তার প্রতিবেশী মহিলা ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৌলভীদের ফতওয়া আহমদীদেরকে যে কোন অজুহাতে হত্যা করা পাকিস্তানে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। এ হত্যাকাণ্ডের কারণও এটিই। আর এ দিক থেকে আমি এই শিশুকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করছি। কারণ যা-ই হোক, কিন্তু এর পেছনে আহমদীয়াতের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে সেটিও সুস্পষ্ট। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সে নিষ্পাপ শিশু ছিল, তার কোন অপরাধ ছিল না।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল, স্নেহের তানযীল আহমদ বাটের মা ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাকে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে নিজের ছোট বোনের পুতুল আনার জন্য পাঠান, যা সে সেখানে ফেলে এসেছিল। সেই বাড়িতে তার যাতায়াতও ছিল। এই ঘটনার আসল কারণ কী, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ঘটনার এক দিন আগে সেখানে পুতুল ফেলে এসেছিল; মা তাকে পাঠিয়েছেন গিয়ে পুতুল নিয়ে আসার জন্য। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন ছেলে ফিরে আসে নি তখন মা নিজেই প্রতিবেশীর বাড়ি যান। প্রতিবেশী মহিলা প্রথমে দরজা খুলে নি। দীর্ঘক্ষণ পরে দরজা খুললে তার কাছে ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, সে পুতুল

নিয়ে ফিরে গেছে। তখন স্নেহের তানযীলের মা তার স্বামী আকীল সাহেবকে সংবাদ দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে মিলে ছেলেকে খুঁজতে আরম্ভ করেন এবং পুলিশের কাছেও রিপোর্ট লেখান। এরপর গলির সিসি টিভি ক্যামেরা চেক করা হলে তাতে ছেলেটিকে প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেলেও বের হতে দেখা যায় নি। তখন পুলিশের সহায়তায় বাড়ি তল্লাশি করা হলে একটি ট্রাঙ্ক থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার হয়। তখন পুলিশ বলে, সেই ঘাতক মহিলার স্বামী পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিল, তার স্ত্রী ছেলেটিকে হত্যা করে লাশ ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে। সেই মহিলা বাড়ির মালিকের ছেলের সাথে মিলে শিশুটিকে হত্যা করেছিল; যা এখন সে স্বীকারও করেছে।

স্নেহের তানযীল আহমদ বাট ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর লাহোরে জন্ম গ্রহণ করে। সে ওয়াক্‌ফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিল, নিয়মিত জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত। নিজ ক্লাসে মেধাবী ছাত্রদের মাঝে পরিগণিত হতো। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল; মৃত্যুর পর যখন তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় তাতে সে ৭৫০ নম্বর এর মধ্যে ৭২৯ নম্বর পেয়ে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। স্নেহের তানযীলের মা বলেন, আমার সন্তানদের মধ্যে তানযীল সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিল; যে কোন কাজ করার পূর্বে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে করত। কোন প্রতিবেশী বা কোন কর্মকর্তাও তাকে কোন কাজের কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ কাজ করে দিত; কখনোই অস্বীকার করত না। এমনকি সেই ঘাতক প্রতিবেশী মহিলাও তাকে দিয়ে কখনো কখনো কাজ করাত এবং সে সবসময় তার আনুগত্য করত, তার কাজ করে দিত। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও জামা'তের কর্মকর্তারাও তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা সবসময় তার প্রশংসা করতেন। সে এমটিএ'র অনুষ্ঠানাদির নিয়মিত দর্শক ছিল; বিশেষ করে শিশুদের অনুষ্ঠান এবং খুতবা ইত্যাদি শুনতো। মসজিদে নিয়মিত নামায পড়তে যেত। তার বাবা কারখানা থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরে যদি মসজিদে যেতে কখনো সামান্য আলস্য দেখাতেন তাহলে স্নেহের তানযীল তাকে জোর করে মসজিদে নিয়ে যেত। স্নেহের মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার পিতা আকীল আহমদ বাট, মা নায়েলা আকীল এবং চার ভাই-বোন রেখে গেছে অর্থাৎ দুই ভাই ও দুই বোন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের কোলে আশ্রয় দিন আর হত্যাকারীদের কৃতকর্মের শাস্তি দিন এবং তাঁর পিতামাতাকে ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেবের। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তাঁর স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেব ১৯৩১ সালে গুজরাত জেলার খুবই নিষ্ঠাবান একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব নিজে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমির Six Long Course-এ পাকিস্তান-সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘদিন তিনি ইসলামাবাদের পলিসি ইন্সটিটিউটের প্রধান হিসেবে দেশের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এভাবে তিনি ৬৬ বছর যাবৎ দেশসেবার সুযোগ লাভ করেন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের জামা'তী সেবা হল, ২০১২ সালে তাকে আমি রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেছিলাম আর ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি শহর এবং জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে তার বদলি হয়। ১৬ বছর পর্যন্ত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের শহর ও জেলার নায়েব আমীর এবং সেক্রেটারী তা'লীম হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর এবং মজলিসে শূরার বিভিন্ন কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন আর আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করতেন। তিনি মিশুক ও স্নেহশীল আর সৃষ্টির সেবক ও অসহায়দের কাজ আন্তরিকতার সাথে করতেন। ধর্মসেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নীতিবান এবং সময়ানুবর্তী ছিলেন। নিজেও দ্রুতগতিতে কাজ করতেন এবং নিজের সহকর্মীদেরও এর জন্য উপদেশ দিতেন। ধর্মের কাজে বরং কোন কাজের ক্ষেত্রেই আলস্য সহ্য করতেন না। নিজ আমেলার সদস্যদেরকে তিনি যে কাজ দিতেন, নির্দিষ্ট সময়ে সে কাজের ফলোআপ অবশ্যই করতেন। অত্যন্ত দোয়ায় অভ্যস্ত, ইবাদতগুযার আর খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তার স্মরণ শক্তিও বেশ প্রখর ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমিক ছিলেন আর আহমদী হওয়ার কারণে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি সব সময় তার মাথার পাশে থাকত। তার পড়াশোনার গণ্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। দরিদ্র ও অভাবীদেরকে উদারভাবে ও গোপনে আর্থিক সাহায্য করতেন। বিশেষত বিধবাদের অভাব মোচনে অত্যধিক সচেতন থাকতেন আর তাদের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আর সাহায্যও এত বেশি করতেন যে, অনেক মানুষ ও পরিবার তার স্থায়ী আর্থিক সাহায্য থেকে উপকৃত হচ্ছিল। একজন একথাও লিখেছে, তার দোকান পুড়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষতি হয়। তিনি গোপনে আমাকে কিছু টাকা প্রদান করেন এবং বলেন, পরবর্তীতে কখনো এর উল্লেখ করবে না। বাড়িতে গিয়ে সে খুলে দেখে যে, তাতে দু'লক্ষ টাকা ছিল। যখন তার ব্যবসার উন্নতি হয় আর সে উক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বলেন, আমি ফেরত নেয়ার জন্য দেই নি।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলার মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব তাহের মাহমুদ সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির, দয়াদ্র, স্বল্পভাষী এবং অত্যন্ত দোয়াগো মানুষ ছিলেন। জুমুআর দিন জুমআর নামাযের অনেক পূর্বেই তিনি এওয়ানে তওহীদে চলে আসতেন আর পরম বিনয় ও আকুতি-মিনতির সাথে নফল আদায় করতেন। যারা দ্রুত নামায পড়তেন তিনি তাদেরকে কাদিয়ানের সাহাবী ও বুযূর্গদের ঘটনা শোনাতেন, যেখানে তিনি তরবীয়ত লাভ করেছিলেন। ধীরে-সুস্থে নামায আদায়কারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করতেন। প্রচলিত দোয়াসমূহ এবং তাসবীহ্ ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি নিজেও দোয়ায় অভ্যস্ত এবং দীর্ঘ নামায আদায়কারী ছিলেন আর অন্যদেরও নামাযের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। অভাবী ও বন্ধুদের সাহায্যকারী ছিলেন–এ কথা প্রত্যেকেই লিখেছে। কেউ যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত তাহলে তাকেও নিষেধ করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর প্রতি তাঁর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল এবং মিটিংএ সেসব পুস্তকের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের

ডাইরেক্টরও ছিলেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারী জনাব নাসের শামস সাহেব লিখেন, তিনি ২০১১ সালের শুরু থেকে ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। বার্ধক্য ও দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সকল মিটিং-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এক দশক পর্যন্ত তার দোয়া এবং সুচিন্তিত পরামর্শ থেকে আমরা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছি। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, মুত্তাকী এবং খিলাফতের প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত জামা'তের সেবক ছিলেন। তিনি বলেন, মরহুমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি তা হল, তার আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং অত্যন্ত বিনয় ও আত্মনিবেদনের সাথে নামায আদায় করা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা হল, মুহাম্মদ দীন সাহেবের পুত্র ডাক্তার হামীদ উদ্দীন সাহেবের, যিনি ১২১ জিম বে গোখুওয়াল, ফয়সালাবাদ নিবাসী ছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের বংশে আহমদীয়াত গুরুদাসপুর জেলার হারসিয়াঁ নিবাসী তার পিতা জনাব মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব এবং দাদা জনাব ফতেহ্ উদ্দীন সাহেবের একত্রে বয়আতের কল্যাণে এসেছিল, যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন। মরহুমের জন্ম হয়েছিল কাদিয়ানে। তার মায়ের আপন চাচা হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কাদিয়ানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের নামকরা আলেম ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কাদিয়ানের মাদরাসা আহমদীয়ার শিক্ষকও ছিলেন। ভারত বিভাগের পর মরহুমের পরিবার ফয়সালাবাদে এসে বসতি স্থাপন করে। পেশাগত দিক দিয়ে মরহুম ডিসপেন্সার ছিলেন যার কল্যাণে তিনি পুরো এলাকায় মানবতার সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করতেন। (তিনি) অত্যন্ত সরল মনা, খোদাভীরু, শৈশব থেকেই নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র নিদর্শনাবলীর সম্মান করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী, পরম স্নেহশীল ও আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসাকারী একজন ঈমানদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কখনো কাউকে কোন বিষয়ে না বলতেন না। তিনি সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সবার উপকারের চেষ্টা করতেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন। তার এক ছেলে করীম উদ্দীন শামস সাহেব জামাতের মুরব্বী, বর্তমানে তানজানিয়াতে সেবা প্রদানের তৌফিক পাচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার কারণে তিনি মরহুমের জানাযার নামাযেও অংশ নিতে পারেন নি। তার এক জামাতা মুরব্বী সিলসিলা এবং আরেক জামাতা জামা'তের মুয়াল্লিম হিসাবে সেবারত আছেন। তার এক দৌহিত্র জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় শাহেদ ক্লাসের শিক্ষার্থী। অনুরূপভাবে তার বেশ কয়েকজন পৌত্র, পৌত্রী ও দৌহিত্র, দৌহিত্রী ওয়াক্‌ফে নও এর কল্যাণময় তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার বংশধরদেরও বিশ্বস্ততার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পালনের তৌফিক দান করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ মার্চ, ২০২০, পৃঃ ১৩-১৭)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)